স্বপ্নময়ের ‘পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ’:এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আত্মকথন

সঞ্জয় মালিক

অনুচিন্তন

আধুনিক জীবনের সার্থক রূপকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ হলেও অনবদ্য পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে তিনি আমাদের অসাধারণ ও মননশীল বেশ কিছু উপন্যাস উপহার দিয়েছেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে শুধু গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নয়, শিক্ষক অভিভাবক রূপে ছাত্রের ভবিষ্যত জীবনের আলোক দিশারী হয়ে ওঠেন। শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ি ও ছাত্র নারায়ণচন্দ্র রাণার জীবন আখ্যান উঠে এসেছে। আদতে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে পূর্ব মেদিনীপুরে শাউরি গ্রামে নারায়ণচন্দ্র রাণার (১৯৫৪-১৯৯৬) জন্ম। লেখক শাউরি গ্রামে নারায়ণচন্দ্রের মা নাকফুঁড়ি দেবীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর স্কুল ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির অবদানের কথা স্মরণ রেখে কল্পনাকে আশ্রয় করে এই উপন্যাস লেখেন। গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে নারায়ণচন্দ্র কীভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন, জীবনের দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, পরিবারে অভাব, জীবনে নারীর সংসর্গ, জীবন সঙ্গিনী নির্বাচনে সংশয়, শিক্ষক মণিলালের অবদান, শেষে নিজে একটা ইকোয়েশন মানে একটা সূত্র ‘ঘরামি ল’ সৃষ্টি, শরীরে রোগের জন্য অল্প বয়সে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মৃত্যু, শিক্ষক মণিলালের হাহাকার— এই সবেরই আখ্যান স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কি অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন তা আমরা আলোচনা করবো।

সূচক শব্দ: বিজ্ঞানের সততা, সাহিত্যের কাল্পনিক সত্য, কুঁজ, হাঁপানি রোগ, শেকড়, মাদুলি, পাউডারের কৌটা, টেলিস্কোপ, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স, ম্যাথমেটিক্স ও ফিলোজফির পার্থক্য, মহাবিশ্ব, কম্পিউটার, প্রথম ইন্টারনেট চালু, গুগুল, আলোকবর্ষ, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, রকেটের গতিপথ, থার্মোডায়নামিক্সের তত্ত্ব, ইকোয়েশন, ঘরামি'স ল, শিক্ষক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জীবন প্রবাহ বয়ে চলেছে। এই জীবন প্রবাহের আঁকে বাঁকে ধীরে ধীরে জমতে থাকে পলি, বাড়তে থাকে ক্লেদ। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লেখকরা আধুনিক ক্লেদাক্ত জীবনের কথা তুলে আনছেন সাহিত্যে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নব্যধারায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী আদুনিক জীবনের সার্থক রূপকার। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প দিয়ে পথ চলা শুরু হলেও অনবদ্য পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে তিনি আমাদের বেশ কিছু অসাধারণ উপন্যাস ও মননশীল প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে যেমন গ্রাম জীবনের যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার কথা তেমনি এসেছে শহর জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক দেউলিয়াপনার কথা। তবে সমাজে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার, অহং, ভালোবাসা, আদর্শ ও প্রবৃত্তি নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। ডারউইনের ‘বিবর্তনবাদ’ অনুযায়ী সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে যাঁরা মানিয়ে নিতে পারেন তাঁরা টিকে থাকে, যাঁরা পারেন না, তাঁরা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হন। একজন শিক্ষক তাঁর আদর্শ ও ভালোবাসা ছাত্রদের অকাতরে বিলিয়ে দেন। বাবা-মার পর ছাত্রদের অভিভাবক শিক্ষক। শিক্ষক নিজের সন্তান স্নেহে ছাত্রদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেন। ছাত্রের সাফল্যে শিক্ষক শুধু খুশি হন না, সেটা নিজের সাফল্য মনে করে আনন্দ পান। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘পাউডার কৌটার টেলিস্কোপ’ এই রকম এক উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৪২২ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে ‘মিত্র ও ঘোষ’ পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নির্মাণে লেখকের ভাবনা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. নারায়ণচন্দ্র রাণা ও তার শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির জীবন কথা।

‘পাউডার কৌটার টেলিস্কোপ’ উপন্যাসে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. নারায়ণচন্দ্র রাণা ও তার শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির জীবনকথা কিছুটা কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। লেখক প্রথম উপন্যাস ‘চতুষ্পাঠী’তে টোল-পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষক

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

অনঙ্গমোহণের আত্মিক মৃত্যু ঘটালেও এই উপন্যাসে শিক্ষক মণিলাল আইচকে ভিন্ন অর্থে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারায় 'গুরু' ও 'শিক্ষক' শব্দ দুটির ব্যঞ্জনা বৃহৎ। সংস্কৃতে 'গুরু' এবং ইংরাজিতে 'TEACHER' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'শিক্ষক'। এই দুটি শব্দের আপাত অর্থে কোন ভেদরেখা না থাকলেও শিক্ষক শব্দের চেয়ে গুরু শব্দে অর্থগত ব্যঞ্জনা একটু বেশি। শিক্ষক কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দেন। আর গুরু শিক্ষার্থীর জীবনে সুকুমর প্রবৃত্তিগুলি জাগ্রত করে, মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে আলোর দিশারী হয়ে ওঠেন। উপন্যাসে মহাকাশের রহস্য সন্ধানী নয়নচাঁদ ঘরামির কাছে মণিলাল স্যার শিক্ষকতার গণ্ডি পেরিয়ে গুরু আসনে আসীন হন। নয়নচাঁদ তখন সবেমাত্র বালক আর মণিলাল আইচ যুবক। বালক বয়স থেকেই মণিলাল আইচের পিঠে একটা টিউমার। যেটা সাধারণত কুঁজ নামে চিহ্নিত।

> "এ জিনিস উটের পিঠে থাকে, মানুষের পিঠে কী করে এল কে জানে? তাও আবার মণিলাল আইচের পিঠে, যাঁকে আকাশ দেখতে হয়, যিনি আকাশ দেখতে ভালোবাসেন, দেখাতেও।"[১]

উট পিঠের কুঁজে জল সঞ্চয় করে রাখে দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দেবার জন্য। যখন রুক্ষ পথ পাড়ি দেয় পিঠে যাত্রী নিয়ে, তখন এই কুঁজ তপ্ত বালিকারাশি থেকে যাত্রীকে রক্ষা করে। মণিলাল আইচও ঠিক যোগ্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাঁর স্বপ্নের ফসল গড়ার জন্য সাধ্য অনুযায়ী সমস্ত সমস্যাকে আড়াল করে লক্ষ্যাভিমুখী দিকে অগ্রসর করে তোলেন। আকাশ দেখা ও দেখানো বাধা বিপত্তি সংকেত এই কুঁজ, সেই সঙ্গে যেন দরিদ্র নয়নের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্যোতক। সমাজের এই অবস্থাকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে মণিলাল সভ্যতার আলোক দিশারী নয়নকে আগলে রাখে। মণিলাল আইচ, বুধখালি কৃপাসিন্ধু বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক। ইস্কুলের রুটিন চার্টে লেখা থাকে এমএলএ। ক্যানিং-এর এই অঞ্চলে মণিলাল আইচের ঠাকুরদার বাবা কোনো জমিদারের নায়েবগিরি করতে এসে এখানে থেকে যায়। গ্রামটির নাম চাচরবেড়া। চাচরবেড়া থেকে ক্যানিং-এর দূরত্ব নয় কিলোমিটারের পথ। এমএলএ স্যার বিয়ে করলেও স্ত্রী মণিমালা মারা যায়। নিজে রান্না করে খায়। গ্রামে কোনো দিন রান্নার সময় জ্বালানি কাঠ, কেরোসিন তেল কিংবা সরসের তেলের অভাবে রান্না হয় না। পাশের মন্ডলদের বা ভোলা মিদ্যার ঘরে কিছু চাওয়ার অজুহাতে খাওয়াটা হয়েই যায়। বয়স তো হয়েছে এই ক'দিন চলে গেলেই হল।

নয়নচাঁদের বাবা ঘরামির কাজ করত, সঙ্গে নয়নচাঁদ যেত বাবাকে সাহায্য করার জন্য। এমএলএ স্যারের ঘর ছাইবার কাজ করতে এসে বাবার সঙ্গে নয়নচাঁদকে প্রথম দেখে। ছেলেটি এমএলএ স্যার কে সুর করে শোনায় গন্ডার হিসাব। ওর বাবাকে বলে ছেলের মাথা খুব ভালো, পাঠশালা শেষ হলে কৃপাসিন্ধু স্কুলে ভর্তি করে দিও, ফোরে বৃত্তি দেয়াবো। কিছুদিন আর নয়নচাঁদের কোন খবর ছিল না। একদিন বাবার সাথে স্কুলে ভর্তি হতে আসে। সে এখন কৃপাসিন্ধু স্কুলের ফাইভে পড়ে। নয়নচাঁদের বাড়ি সুন্দরবনের নদেখালি। স্কুলে নয়নচাঁদ ঘরামির প্রতি এমএলএ স্যারের নজর পড়ে—

> "ছেলেটির দিকে নজর পড়েছে আগেই। ছেলেটি বড় রুগ্ন। স্কুলে এসে কিছুক্ষণ হাঁপায়। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন— কীরে, হাঁপানি রোগ আছে নাকি? ছেলেটা মাথাটা উপরে নিচে দু'বার নাড়িয়ে ছিল। মানে আছে। চিকিচ্ছে করাস? ছেলেটা হাতে বাঁধা শেকড় আর মাদুলি দেখিয়েছিল।"[২]

এমএলএ স্যার বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার গল্প শোনায়। গরিব ঘর থেকে কীভাবে বড় হয়েছে। জোয়ার-ভাটা পড়ানোর সময় নয়নচাঁদ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় স্যারের কাছে—

> "নয়ন মাথা নাড়ে। বলে, বুঝিনি স্যার। চাঁদের যদি এতই আকর্ষণ, তবে আকাশের সব মেঘ চাঁদের দিকে চলে যায় না কেন? মেঘ তো চাঁদের আরো কাছে। মণিলাল স্যার কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না। সত্যিই তো। এইটুকু ছেলেকে মেঘের জন্মবৃত্তান্ত, মেঘের অবস্থান কী করে বোঝাবেন? শুধু নয়নচাঁদকে টেনে নেন। শরীর সংলগ্ন করেন। দুই অসম উচ্চতার অসমবয়সি দু'জন দুটো প্রশ্নচিহ্ন ধারণ করে পরস্পরের সংলগ্ন।"[৩]

এমএলএ স্যার আকাশের রহস্য আবিষ্কারের জন্য নিজেই একটা টেলিস্কোপ তৈরি করেন। পুঁটির ঢিবিতে বসে মহাকাশের রহস্য মাপার অসীম স্বপ্ন দেখেন— তিনি ও বকখালির শ্রমজীবি মানুষ এবং গুটিকয়েক ছাত্র—

> "আসলে এটা একটা পাউডারের কৌটোই ছিল আদতে পরে পিতলের পিচকিরির সামনের মুখ আর পিস্টন খুলে নিয়ে পাউডারের কৌটোটা পিচকিরির ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে। এই নলে দুটো লেন্স বসিয়ে নিয়েছিলেন মণিলালবাবু। আদি টেলিস্কোপ তো এরকমই ছিল। লিপারসি নামে একজন চশমার ব্যাপারি তৈরি করেছিলেন টেলিস্কোপ। ...মণিলাল স্যারও টেলিস্কোপটির বিবর্তন ঘটিয়েছেন, নলটা গামা রে ঝালাই করে বড় করেছেন। কলকাতা থেকে বড় পিচকিরি কিনে, লেন্সের দোকান থেকে লেন্স কিনে— আর একটু ভালো টেলিস্কোপ বানিয়েছেন। ক্যাম্বিসের কাপড় কিনে দরজিকে দিয়ে বানিয়েছেন খাপ, মনে মনে একটা নামও রেখেছেন- সুনয়নী। ওঁর মায়ের নামে। টেলিস্কোপ তো সুনয়নীই। একটা শক্তিশালী চোখ। এই চোখ দিয়ে তিনি দেখেন লালচে মঙ্গলগ্রহ, বিশাখা-চিত্রা-ভরণী নক্ষত্র, চাঁদের গায়ের অন্ধকার, সবাইকে দেখান। উনি শনি গ্রহের বলয়টাও দেখতে পান, অন্যরা দেখতে পায় না। উনি চাঁদের পাহাড়ও দেখেন, চাঁদের গাছের খানাখন্দ, উঁচুনিচু জমি, ছিটিয়ে থাকা পাথরও। দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু কল্পনা করে নিতে হয়। কল্পনা থাকলে, আর দেখার চোখ থাকলে, দেখার ইচ্ছে থাকলে দেখা যায়। নয়নচাঁদ দেখত। নয়নচাঁদ বলত দেখতে পাচ্ছি স্যার।"[৪]

নয়নের বাবা অসুস্থ পর নয়নের উপর চাপ পড়ে, যে করেই হোক টাকা রোজগার করতে হবে। মায়ের মুড়িভাজা ও ঢেঁকি ভানায় খাবার জোটে না। বড়লোকেরা বাড়িতে ঢেঁকির পাঠ চুকিয়ে দিয়ে চাল ছাঁটিয়ে নিয়ে আসে। গ্রামের মধ্যেও প্রযুক্তির আবির্ভব ঘটছে। বুধখালিতে ইলেকট্রিক এসেছে, ধান ছাঁটার মিল তৈরি হয়েছে, ভটভটি কিনেছে অনেকে। এমএলএ স্যার পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নয়নকে ভূগোল পড়িয়েছেন। কলকাতায় বিড়লা তারামণ্ডল দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। নয়নকে অঙ্কে ভর্তি জন্য মনিলাল স্যার বোঝায়, বোঝায় ম্যাথমেটিক্স ও ফিলোজফির মধ্যে পার্থক্য—

> "এই যে বন্ধনে গড়া মহাবিশ্ব, এর মধ্যে মুক্তি আবার কী? মুক্তি বলে কিছু কিছু আছে? সব প্রশ্নের উত্তর ফিলোজফি দিতে পারে না। ফিলোজফি হল একটা বক্তব্য। ম্যাথমেটিক্স হল প্রুফ। লোকে

বলে বিজ্ঞান যেখানে শেষ, দর্শন সেখানে শুরু। আমি কী বলি জানিস নয়ন, সায়েন্সও ফিলোজফি। ম্যাথমেটিকস হল সবচেয়ে বড় ফিলোজফি। বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন ম্যাথমেটিসিয়ান, কিন্তু কত বড় দার্শনিক। আমি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম্বার-টম্বর বুঝি না, কিন্তু সাধারণ সাধারণ জিনিস— যেমন সমান্তরাল রেখা- পাশাপাশি চলে যাবে, কোনদিন মিশবে না- ফিলোজফি নয়? একটা বিন্দুর ধারণাও একটা দার্শনিক চিন্তা। আর অসীম ব্যারটাকে বোঝা চাট্টিখানি কথা?”[৫]

প্রেসিডেন্সি কলেজের থেকে নয়ন এম.এস.সি. পাশ করে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সে। অনন্যা ফার্স্ট আর নয়ন সেকেণ্ড। অনন্যা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে নয়নকে। কলেজে বারান্দায় নয়ন পড়ে যায়, সব কিছু অন্ধকার দেখে। রিক্সায় করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে অনন্যা। তখন গার্জিয়ান বলতে তো অনন্যাই। অনন্যা নয়নকে লাইক করতো কিন্তু নয়ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। ডাক্তারবাবু সমস্ত রিপোর্ট দেখে রোগটার নাম বলেন— ইউওপ্যাথিক হাইপারট্রপিক সাব অ্যারোটিক স্টেনোসিস উইথ কমপ্লিট লেফ্‌ট বান্ডিল ব্র্যাঞ্চ। অপারেশন করে রোগ সারবে না, নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। নয়নচাঁদ দেশের ঘরে এলে মণিলাল স্যার চলে আসে দেখা করতে। ছাত্র এতো বড় হয়েছে, তার কাছ থেকেও তো কিছু শিখতে ইচ্ছে করে। মণিলাল বলে মেঘের মধ্যে কি করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? আমি তো বোঝাতাম মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়—

“নয়ন বোঝায় থার্মোডায়নামিস্ক-এর তত্ত্ব। এডিয়াবেটিক সিস্টেম, এনট্রপি, এনথালপি...। বোঝায় কী করে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ হয়, মেঘের মধ্যে ঘূর্ণি, মেঘের বরফকুচির মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার। উপযুক্ত ছাত্রের ছাত্র হয়ে যেতে কী সুখ, কী সুখ! রাত্রে ওরা দু’জন গল্প করে। টেলিস্কোপটা দিয়ে আকাশ দেখে। হয়তো একই নক্ষত্র দেখে বারবার। দুর্বল এই পাউডার কৌটার টেলিস্কোপে যতটুকু দেখা যায়। দেখেছিস, ওই যে উত্তরভাদ্রপদ, অ্যান্ডোমিডা বলে সাহেবরা, খালি চোখে যেন আকাশের গায়ে এক ফোঁটা উজ্জ্বল কুয়াশা, ওটাই তো এই সুনয়নীটা দিয়ে দেখলে কেমন যেন আসাশের ঘামাচির মতো লাগে, তাই না? একই দৃশ্য কতবার! নয়ন বলে, হ্যাঁ স্যার, কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে।”[৬]

আমেরিকার আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. তে চান্স পায় নয়ন এবং অনন্যা। অনন্যার পি.এইচ.ডি.র বিষয় রকেটের গতিপথ সংক্রান্ত এবং নয়নের বিষয় ইন্টার গ্যালাক্সি ডাস্ট। দুই নীহারিকার মধ্যবর্তী পদার্থ। গাইডের হলেন একজন জার্মান ফ্রিডরিক হাইজেনবার্গ। এখানে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে নয়ন, তবে ছোট একটা সার্জারি করে ডাক্তাররা। পি.এইচ.ডি. শেষ করে নয়ন যায় ওকলাহামাতে আর অনন্যা যায় মিশিগানে পোস্ট ডক্টর করতে। এখান থেকে দু’জনে আলাদা হয়ে গেল। নয়নের বিষয় ছিল বুধ গ্রহে ঋতু। একটা বড় মাপের কাজ শেষ হলে, প্রতিদানে পেল—

“যার জন্য একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়ে গেল নয়ন। ইয়ং সায়েন্টিক অ্যাওয়ার্ড। তারপর ইংল্যান্ডের ডারহামে অধ্যাপনা, সেই সঙ্গে গবেষণা। আর্নল্ড ওয়ালফেল্ডালের তত্ত্বাবধানে কেমিকেল ইভ্যুলেশন অব গ্যালাক্সি। মণিলাল স্যারকে চিঠিতে জানাল, স্যার, শরীরের কাজ শরীর করছে, আর আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করবেন। তিন বছরের মধ্যে আটখানা পেপার ছাপা হল

> আন্তর্জাতিক পরিত্রকা কসমিক-এ। এবার দেশে ফেরার জন্য ছটফট করতে লাগল। নয়নকে ডেকে নেয় TIER মানে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ। পুণেতে। ওখানে বিরাট অ্যান্টেনার রেডিও টেলিস্কোপ। সেটা হল ১৯৮৩ সাল।"[৭]

১৯৯৫ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় বি.এস.এন.এল. এর মাধ্যমে। নয়নের অফিসে এপ্রিলের মাসে ইন্টারনেট সংযোগ হয়। নয়ন প্রথম ইমেলে কথা বলে অনন্যার সঙ্গে— ইয়েস, দিস ইজ ইন্টারনেট। মাই ইন্টারনেট। আই অ্যাম ব্লেস্ড বাই ইউ অ্যান্ড উইথ ইন্টারনেট টু...। অক্টোবর মাসে পূর্ণগ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নকশাল আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার পর সমাজে ছাত্ররা স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানে আন্দোলন গড়ে তোলে। মণিলাল স্যারের মহাকাশ ব্যাখ্যা নয়নের কাছে মহাকাশের রহস্য ও জীবনের রহস্য কোথায় যেন এক হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যে কোনো মহানির্দেশকের পরিচালনায় গাণিতিক নিয়মেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের যাত্রাপথ পরস্পরের বাধা প্রাপ্ত হয় না। এই যে রহস্যের বীজ তার বীজকোষের ভিতরেই আছে। এতো শুধু মহাকাশের রহস্য আবিষ্কার নয়, জীবনের পরিমাপেরও যেন সূত্র—

> "অথচ এই আকাশে এত লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র, ধূমকেতু, কোনো বিশৃঙ্খলা নাই, সব ফরমুলায় চলছে। এইসব ফরমুলাগুলি ঝানতে পারলে, বুঝতি পারলি, তবে তো পোষ্কার হবে কে আমি, কে তুই...। কেন আমি কেন তুই...। সবই ভগবানের খেলা বললিই চলবে? ওটার মানে ফাঁকি মারা। সব তিনি করাচ্চেন। আরে, তিনিটা কে জানতে ইচ্ছে করে না বাপ? তাঁর এত শক্তি এল কোন্ থে? সোর্সটা কী? সব কিছু ওই আকাশে।"[৮]

মণিলাল নয়নের জিজ্ঞাসু চোখে অসীম রহস্যের ছবি এঁকে, তারই সামান্তলার তুলনামূলক স্বচ্ছল ভোলা মিদ্যার ছেলে সুবলের ছবি আঁকেন। সুবল বুধখালি কৃপাসিন্ধু বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে উননব্বই পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাশ করে। চারটি বিষয়ে লেটার পেয়ে পাশ করে। চারটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে ম্যাথমেটিসকে ভর্তি হয়। মণিলালের রিসার্চের কথা বাদ দিয়ে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে এম.সি.এ. পড়তে চায়। নয়ন যেখানে মহাকাশের রহস্যের অতলে হারিয়ে যায়, সুবল বাস্তবতার কথা বলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থানাধিকারী সুবল জাগতিক সফলতার কথা ভাবে—

> "...এত ধৈর্য নেই। এখন কম্পিউটারের যুগ। চাকরি করব। কগনিজেন্ট ইনফোসিস, গুগুল...। অনেক মাইনে।"[৯]

মণিলাল স্যারকে শুনতে হয়— নয়ন পরিবারের জন্য কি করেছে, বাবা যাত্রায় ভূত সেজেছে, মা পরের বাড়িতে মুড়ি ভেজেছে। একটা পাকা বাড়ি পর্যন্ত করেনি। উচ্চ স্বরে বলে সুবল—

> "কেবল আকাশ-আকাশ। কী দিয়েছে আকাশ? আমি স্যার প্র্যাক্টিক্যাল। আমি আকাশ দেখি না পৃথিবী দেখি। আকাশ না থকেলে কি পৃথিবীটা হত রে সুবল... মণিলাল মিন মিন করে। ...আমি ঠিক করে ফেলেছি একটা ভালো জায়গায় এমসিএ পড়ব। ব্যাস ফাইনাল। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনব। আপত্তি আছে?"[১০]

একজনের চোখে স্বপ্ন জীর্ণাবস্থা থেকে মহীরূহ হয়ে উঠতে চাইছে, অন্যজন জাগতিক সুখ কিনতে চায়। নয়নের কাছে

স্বপ্ন মহান কীর্তি, সুবলের কাছে স্বপ্ন জাগতিক পণ্য।

নয়নের জীবনে এসেছিল দুই নারী, মানিনী ও অনন্যা। একদিকে মানিনী যতোটা সত্য সত্য নয়নের জীবনে অন্যদিকে অনন্যাও তাই। নয়নের জীবন পরিধির মধ্যে মানিনী মুক্তি খুঁজেছিল। অনন্যা জীবনে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করেও নয়নের সততার উপর বিশ্বাস রেখেছিল। লেখক সচেতন ভাবেই গ্রাম ও শহরের দু'নারীর অবস্থানকে সময়োচিত বাস্তবতায় উপস্থাপন করেছেন। স্বল্প শিক্ষিত মানিনী জীবনের ভিন্নতায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে জীবন থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেয়। আর শিক্ষা ও সাফল্যের সর্বস্তরে পৌঁছেয়ে সাহেব বরের হাতে নির্যাচিত হতে হয় অনন্যাকে।

মহাকাশের অপার রহস্য উদ্ঘাটন অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস মাপার জন্যই টাটা ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর সিনিয়ার সায়েন্সটিস্টদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করে। আর এদিকে মণিলাল স্যার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য গাঁয়ের লোক ও ছাত্র জোড় করে পুঁটির ঢিপিতে টেলিস্কোপ নিয়ে বসে যায়। আসলে মণিলালের জ্যোতির্বিদ্যা-আকাশের যে অপার রহস্য অনুসন্ধান তা উপযুক্ত আধারের অভাবে অপাত্রে হারিয়ে যায়। আসলে মণিলালের জ্যোতির্বিদ্যা-আকাশের যে অপার রহস্য অনুসন্ধান তা উপযুক্ত আধারের অভাবে অপাত্রে হারিয়ে যা 'নদী তুমি কেথা হইতে আসিয়াছ? উত্তর আসে মহাদেবের জটা হইতে।' এখানে বিজ্ঞানের সত্যতা যতখানি আছে, ঠিক ততটাই সাহিত্যের কাল্পনিক সত্য লুকিয়ে আছে। মণিলাল স্যারের কথা মনে রেখেই নয়নের আত্মানুসন্ধিসু মনে বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের চলমানতাকে পদার্থবিদ্যর নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় অনুধাবন করে নয়ন। সেই সঙ্গে পরিমাপ করে নিজের স্বল্প পরমায়ুর জীবনকে—

> "সময় কি পাওয়া যাবে, নাকি শমন এসে নিয়ে যাবে? মানুষের জন্ম নিশ্চিত নয়, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। যখন তখন এই মৃত্যু এসে যেতে পারে।"[১১]

জীবনের এই অনিশ্চিতায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্নকে কল্পনা করে—

> "একটা সূত্র যদি আবিষ্কার করা যায়, একটা ইকোয়েশন, যা নাকি অনেক প্রশ্নের জট খুলে দেবে, সেই ইকোয়েশনটার নাম কী হবে? ঘরামি'স ল? ...ঘরামি'স ল, কিংবা ইকোয়েশন অব নয়নচাঁদ!"[১২]

লেখক কোথায় যেন শ্রেণি বাস্তবতার নির্মম সত্যকে অস্বীকার করে হাপর টানা নয়নের স্বপ্নকে সময়ানুযায়ী সত্য করে তোলেন। তাই প্রথমে জাতপাত, তারপর গ্রাম-অঞ্চল-শহর-দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পৌঁছে যায়। যেমন করে মানুষ চাঁদে পৌঁছায়। নয়নের জীবনের এই সংগ্রামও কম কঠিন নয়। একদিকে জীবনে অল্প সময় অন্যদিকে মহাকাশের ব্যাপ্তি কোথায় যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। সময়ের যেমন প্রসারণ ও সংকোচন আছে, তেমনি জীবন ও মৃত্যু সমান্তরাল পথে চলে। তাই ডাক্তারের বেঁধে দেওয়া গণ্ডি অতিক্রম করে নয়ন জীবনকে খোঁজে মহাকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে অঙ্কের বীজ আর জীবনের বীজ দুটোকেই সে বহন করে চলে। একটা ইকোয়েশন আবিষ্কার করতে গিয়েই লেখক কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন পাঠককে। রাজস্থানে জয়সলমীরের উত্তপ্ত পরিবেশ ও পূর্ণগ্রহণে সূর্যের ব্যাস পরিমাপের আনন্দ ঘন মুহূর্তে নয়নের হৃদয়যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায়। শরীরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে মহাকাশকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ছেলেবেলা সে স্বপ্ন দেখেছিল থুথু দিয়ে মুছে দেব বিধিলিপি।

আগের দিন আনন্দঘন মুহূর্ত কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর মণিলাল স্যার খবরের কাগজে চোখ রেখে দেখতে পেল—

> "...আট লাইনের কেটা ছোট্ট খবর জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মৃত্যু। জয়সলমিরে একটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে গ্রহণ চলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা গেলেন এক তরুণ বিজ্ঞানী ড. এন সি ঘরামি। পর্যবেক্ষণরত অবস্থা অসুস্থ বোধ করেন, জয়সলমিরের হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুকালে ওঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২। মণিলাল স্যার সফল গ্রহণ উৎসবের পরের দিন স্কুলে গিয়ে দেখলেন সব কিছু থমথমে। শুনলেন পড়লেন। পাথর হয়ে থাকলেন। সূর্যের দিকে বক্র তাকালেন। সূর্য, তুই ছেলেটাকে খেয়ে নিলি? স্কুলে ঘন্টা বাজল। হাতুড়ি মারছে ধাতুর পাত্রে। হাতুড়ি লাগছে মণিলালের বুকে।"[১৩]

তথ্যসূত্র

১। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'পাউডার কৌটার টেলিস্কোপ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ- ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮।

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

১০। তদেব।

১১।পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

১২।পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

১৩।পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', ৩য় সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল-২০০৪।

২। আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাঃ), 'আকাদেমি বানান অভিধান', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জুলাই-২০১১।

৩। উত্তম দাশ, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', ২য় সং, বারুইপুর, মহাদিগন্ত -২০০২।

৪। ব্যাসদেব ঘোষ ও সুব্রত দাস (যুগ্ম সম্পাঃ), 'একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস', ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, মদনপুর, আগস্ট-২০১৮।

৫। রামেশ্বর শ, 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ', পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, নভেম্বর-২০০৫।

৬। সুদেষ্ণা মৈত্র ও প্রতিমা সাহা (যুগ্ম সম্পাঃ), 'স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কথাসেলাই: পাঠকের নকশিকথা', সোম পাবলিশিং, কলাকা, এপ্রিল-২০১৯।

সহায়ক পত্র পত্রিকা:

১। অভিজিৎ মাইতি, তবু একলব্য সময়ের সংলাপ, মে-২০১৩।

২। ঋত্বিক ত্রিপাঠী (সম্পাঃ), জ্বলদর্চি পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-২০১৬।

৩। তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর-১৯৯৫।

৪। তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, ছোটগল্প বিশেষ সংখ্যা, শারদীয়-১৪১২ বঙ্গাব্দ।

৫। মনোরঞ্জন সরদার (সম্পাঃ), পথ সাহিত্য পত্রিকা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা, জুলাই-২০১৮।